

গ্রামে শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

মো. এনামুল হক খান

কোমলমতি, শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে আনন্দময় স্থান। যেখানে শিক্ষার্থীরা ফুলে যাবে, মনের আনন্দে, ফলাফল ভালো করবে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়, চারদিকে সবুজ প্রান্তর, বৃক্ষ-উল্লসিত ঘেরা গ্রামের আকাশ, বাতাসে বিঘাত ছাই-সিনা নেই, গাড়ির বিকট শব্দ-পরিবেশ দূষণ নেই। তা সত্ত্বেও প্রকৃত জ্ঞানার্জন, শিক্ষার হার ও ভালো ফলাফলের দিক থেকে এখন শহর এগিয়ে। এক সময় গ্রামের ছেলেরা ফলাফলের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল না। তবে গ্রামে শিক্ষার হার কম ছিল, কারণ অতীতে বেশিরভাগ অভিভাবক মেয়েদের স্কুলে দিত না। ফলে গ্রামের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নিরক্ষরই থেকে যেত। আজ সেই অবস্থা নেই, অভিভাবকদের মনোভাব অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মেয়েরা দলবদ্ধে স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু সন্তানের পড়াশোনায় যে পরিবেশ দরকার, উৎসাহ-উদ্বীপনা ও তদারকি দরকার তা পাচ্ছে না। এ কারণে পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয় না। ভালো ফলাফল ও শিক্ষার অগ্রগতিতে অভিভাবকদের অধিকতর সচেতনতা প্রয়োজন। সন্তান পড়ার সময় পড়ে কিনা, খেলার সময় খেলে কিনা দেখা প্রয়োজন। আজ্ঞা দেয়া, পাড়া-মহত্ম্য ঘুরে বেড়ানো-সময় নষ্ট করা থেকে বিরত করা অভিভাবকের কাজ। গভর্নির বডি, উপজেলা প্রশাসন, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব হলো স্কুলে ভালো-যোগ্য ও মানসম্মত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। শিক্ষক নিয়োগে অযোগ্য আত্মীয়-স্বজন, এলাকার লোক বা দলীয় লোকদের অবশ্যই বর্জন করা প্রয়োজন। অনিয়ম বর্জনশীল পরিহার করা দরকার, গ্রামে এর বড়ই অভাব, এই অভাব দূর করতে নিতে হবে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ। সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাতালিকা করে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মনে আশার আলো ফুটে উঠেছে। আগে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম ছিল। ছেলেরা কেউ বাড়ি থেকে আসা যাওয়া করতে আবার অনেকে লজ্জিত থাকত। ছাত্র পড়া-নিজের পড়াও সাহায্য। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

সংখ্যা বেড়েছে, লজ্জিত থাকার প্রয়োজন পড়ে না। বাড়ি থেকেই শিক্ষার্থী স্কুলে যেতে পারে। আগে মানসম্মত শিক্ষক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতায় আসত, তারা এই পেশাকে সম্মানজনক মনে করত, উচ্চ বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতায় এসেছেন এমন নজির অনেক। তারা ছাত্রদের বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ার খোঁজববর নিত, অভিভাবকদের পরামর্শ দিত, তখন শিক্ষকদের তেমন অভাব অনুভব ছিল না। হাট-বাজারে তাদের গল্পগল্প করতে দেখা যেত না। গ্রামের ঝগড়া বিবাদে দরবার-সালিশি ও তারা তেমন যেত না। আর কোটিং বাণিজ্য ছিল তাদের চিন্তার বাইরে।

আজ মেধাবী শিক্ষক শিক্ষা পেশায় থাকতে চায় না। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি হলে শিক্ষকতা ছেড়ে দেয়। কারণ গ্রামের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা তারা তেমন পায় না। তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারায় অনেক কমেছে, যা দিয়ে সংসার চালাতে পারেন। সরকার শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেল প্রদানের চিন্তা করে ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যেতে পারেনি। এমনি অবস্থায় তারা হতাশামুগ্ধ। নিয়মনীতির মধ্যে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে হতাশা দূর করতে হবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে অব্যাহত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যেমন কম্পিউটার, দায়িত্ব-কর্তব্য ও শিক্ষার উন্নয়নে করণীয়, নৈতিকতা, তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানার্জন ইত্যাদি। তাদের স্কুল ক্যাম্পাসে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা ইউনেস্কোর মতে মানসম্মত শিক্ষা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। (১) শিক্ষক (২) শিক্ষাক্রম (৩) শিক্ষার পরিবেশ। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামে আজ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, কিন্তু বাড়েনি শিক্ষার মান। দু-একজন যোগ্য শিক্ষকের প্রচেষ্টায় তা অর্জন করা সম্ভব নয়-সকল শিক্ষকই যোগ্য ও মানসম্পন্ন হওয়া চাই। শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সরকার প্রত্যেক প্রাথমিক

শিক্ষার্থীর জন্য উপস্থিতির যোগ্যতা দিয়েছে এটা অবশ্যই ভালো খবর। ভালো ফলাফল ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এটাও ইতিবাচক দিক। এর সঙ্গে অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা যোগ হলে ভালো ফল আসবে। অনেক উচ্চশিক্ষা কর্মকর্তা-অর্থবিত্তের মালিক রয়েছেন যারা গ্রামের সন্তানদের খোঁজববর নেন না। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে ভাবেন না, তাদের উৎসাহ প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। এখনো গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর একটি অংশ লেখাপড়া থেকে হিটকে পড়ছে, যা খবই দুঃখজনক। আর্থিক সঙ্গতি ও পিতা মাতার সদিচ্ছার অভাবে তাদের এই অবস্থা। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, মেম্বর, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ভূমিকা রাখতে পারেন।

দেশের প্রায় ৮০% মানুষ গ্রামে বাস করে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে হলে সন্তানের প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধিতে নজর দিতে হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি সহকারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হবে সকল ছাত্রের জন্য শিক্ষার হার অব্যাহত করা। যোগ্যতা আছে ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই এটা কারো কাম্য নয়। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। খেলাল রাখতে হবে বিপুল জনগোষ্ঠী যাতে দেশের বোঝা না হয়। বেকারত্বের অভিগায়ে তাদের পড়তে না হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফলের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হবে অন্যতম কাজ। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বাধীনতা উত্তর বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। যেমন ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন, পরবর্তীতে কাজী জাফর আহমদ শিক্ষা কমিটি, ড. আবদুল মজিদ শিক্ষা কমিশন, অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ শিক্ষা কমিশন, জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটি ইত্যাদি।

সরকার সর্বশেষ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে

বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। মনে রাখা দরকার শিক্ষার মূল সোপান হলো শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ও বয়োজৈষ্ঠ্যদের সম্মান বোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তোলা। সদা সত্য কথা বলা, ন্যায়পরায় ও ধোকাবাজ নয় এমন সহপাঠীকে বন্ধু হিসেবে যেন বেছে নেয় তা শিক্ষা দেয়া। তাদের আরো ধারণা দেয়া যে, বাঙালির অতীত বিরতুগাথা, তারা অলস-অর্থব নয়, পোষণ-বধনায় নিম্ন হয়েছিল, কিন্তু মাথা নত করা শিখেনি। তাদের মেধা বিকাশের প্রচেষ্টার পাশাপাশি শিক্ষা দিতে হবে যে, নকল করে পাস করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া উত্তম, একটি টাকা কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে উপার্জন করা সম্মানের কাজ। আরো যে বিষয়টির প্রতি নজর দিতে হবে তাহলে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মজবুত অবকাঠামো তৈরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ব্যবস্থাসহ বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও এর ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে থাকবে লাইব্রেরি, উন্নত সেটিন, সেপটিকট্যাংক, বিতক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা। স্কুল ভবন হবে সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, থাকবে পেলার মাঠ, পুকুর, যেখানে প্রতিনিয়ত খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। আরো থাকবে কবিতা, গল্প, সঙ্গীত, শরীর চর্চাসহ সংস্কৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা। ভালো ফলাফলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উৎসাহ প্রদান কার্যক্রম অবশ্যই রাখতে হবে। নির্দিষ্ট কোন এলাকা ও তহসিলদার বিদ্যালয় সমূহে দ্রুত শিক্ষার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চাইলে শিক্ষক-অভিভাবক-এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা চাই। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফল নির্ভর করবে এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব উদ্যোগের ওপর। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে, গ্রামে শিক্ষিত-উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাবে। তারা পরবর্তী জীবনে আত্মকর্মসংস্থানসহ গ্রামে ছোট-বড় কলকারখানা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করবে, দেশে বেকারত্ব ঘুচবে।

[লেখক: প্রকৌশলী, কলামিস্ট]